ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

# সমকালীন নারী অধিকার প্রসঙ্গ : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মুহাম্মদ মসিউর রহমান*

***Abstract**: Islam has a clear message; it has a well-defined plan to protect, guard and preserve a universal family system. Islam changed all that, not as a natural progressive outcome of social tensions but as an arbiter of values. A social system was dictated from on high, which was unrelated to the normal force to shape a society. It rebuilds woman rights in the society, where it has been totally demolished.*

*The society in Arab at that time was extremely paradoxical in its attitude towards woman. On the other hand, sexual permissiveness, the free mixing of men and woman and mad orgies of wine, woman and song were the highlights of Arab society. The birth of a girl was considered to be a mater of disgrace and extreme shame. That time some proud Arab is even reported to have buried their new born daughter with their own hands to escape this ignominy. Women were treated as chattels and were deprive the right to oppose their husband, fathers or other male members of the family. To this context some burning issues are discussed here on the basis of Al-Quran and Hadish.*

## ভূমিকা

পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, ওমা ইজাল মাওউদাতু ছুয়িলাত, বি আইয়ে জামবিন কুতিলাত (আল কুরআন ৮১ ঃ ৮-৯) অর্থাৎ, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ? এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হল প্রোথিতকারী নরপিশাচদের অপরাধ প্রকাশ করা (তফসীরে মারে'ফুল কুরআন - ৮ম খণ্ড, ৮২৫ পৃঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)। বর্তমান যুগে কন্যা বা নারী হত্যা বা অত্যাচার নিরোধে কঠোর আইন প্রণীত হয়েছে। এটা অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের এই যুগই হল সেই প্রতিশ্রুত যুগ। কেননা এ যুগেই নারী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছে নারী নির্যাতন সম্বন্ধে। আজ একবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সভা হচ্ছে, সমিতি হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে এবং বিশ্ব নারী দিবস পালন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে জাতীয়ভাবে বিভিন্ন সংগঠন বা ফোরাম এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যখন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব হয়, তখন নারী সামাজিক মর্যাদা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এ অবস্থা থেকে ইসলামের মাধ্যমেই নারীর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সূচনা।

---

* উপ-পরিচালক (খেলাধূলা), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

পুরুষের মত নারীও মানুষ। এই বাস্তবতাকে ইসলাম পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে। আল-কুরআন একাধিক স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, নর ও নারীকে একই নফস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনে এই ঘোষণা অনুসারে মানবিক পর্যায়ে নর ও নারী যে অভিন্ন তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

আল-কুরআনে শাস্তি ও পুরস্কারের ক্ষেত্রে নর-নারীকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। ভাল কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজে শাস্তি আল্লাহর এই বিধানে নর-নারীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই (আল-কুরআন ৩ঃ১৯৫)। নারীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে (আল-কুরআন ২৪ঃ১৩)। সমভাবে পুরুষের উপরও আদেশ জারী করা হয়েছে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে (আল-কুরআন ২৪ঃ৩০)। ইসলামী ব্যবস্থায় পাত্রের যেমন অধিকার আছে পাত্রী নির্বাচনের, তেমনি পাত্রীরও অধিকার আছে পাত্রকে নির্বাচনের (আল হাদিস ঃ আবু দাউদ)। মুসলিম বালেগ নারী নিজেই যে কোন পুরুষকে বিবাহ করার অধিকার রাখে। তবে কিছু আত্মীয়-স্বজনকে তার জন্য বিবাহের অনুপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (আল-কুরআন ৪ঃ২২-২৩)।

কন্যা হওয়ার কারণে যে যুগে তাদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো, সে যুগে ইসলাম নারীর জন্য যে ইজ্জত ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে তা সর্বকাল উপযোগিতার এক অপূর্ব নিদর্শন। কঠোর কিয়ামতের মাঠে কন্যার পিতাকে হযরত (সঃ) তাঁর পাশে রাখবেন বলে হাদিসে এমন প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এমনকি সারা পৃথিবীর কোন অংশে নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃতি পায়নি, সে সময়ে ইসলাম নারীর উত্তরাধিকারের ঘোষণা করেছে (আল-কুরআন ৪ঃ১১-১২)। প্রকৃতপক্ষে, নারী কল্যাণে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম অবদান হয় উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, মায়ের পায়ের তলায় বেহেস্ত (আল-হাদিস)। অতএব এই দুনিয়ার এমন কেউ নেই যার মর্যাদা মায়ের সমকক্ষ। সন্তানগণ যাতে তাদের মায়ের প্রতি যত্নবান হয় সেজন্য পবিত্র কুরআন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে শৈশব কালের অসহায় দিনগুলোর কথা।

ইসলাম অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করেনি। ইসলাম নারীকে নির্দেশ দিয়েছে তার দৃষ্টি সংযত রাখতে এবং এমনভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করবে না, যাতে পরপুরুষ অযথা তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়। অবশ্য এ নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, নারী শুধু ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কেননা আবদ্ধতার মধ্যে দৃষ্টি সংযত করার কোন প্রয়োজন নেই। একজন অবরুদ্ধ নারীর পক্ষে পরপুরুষকে উত্তেজিত করার অবকাশই-বা কোথায়? ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অবরোধ নেই, কিন্তু শালীনতা রক্ষার নির্দেশ আছে।

অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইসলাম পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব এবং অপত্য সম্পর্কের পরিচর্যা এবং রক্ষার সমর্থন করে। ইসলাম সেই বন্ধুত্বকে ও উৎসাহিত করে যা পার্থিব হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি স্বর্গীয়। জৈবিক তাড়নায় অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক সম্মিলনের বিরুদ্ধে যথাযথ পৃথকীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সতীত্বের জীবন যাপন করার প্রতি জোর তাগিদ দিয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষা পরিবার পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি পরিবারকে নিরাপদ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক সমাজগুলো ইসলাম নির্দেশিত সামাজিক আবহাওয়ার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করে না। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড এবং ভাগ্য নির্ধারণে খোদাতালার ভূমিকা রয়েছে। এই ধারণা বা কনসেপ্টের সঙ্গে মানুষ একমত হোক বা না হোক খোদার বান্দার ন্যায় সে তার আচরণ গড়ে তুলুক বা না তুলুক, এটা একেবারে নিশ্চিত যে, মানুষ খোদার কাজকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) বা খোদার বাণীকে (অর্থাৎ যাবতীয় সত্যকে) পরাভূত করতে পারে না। ঐশি কাজ এবং ঐশি বাণী পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অখণ্ডনীয়, তাই যে কোন সামাজিক আচরণ সরাসরি খোদার বাণীর বিরুদ্ধে অবলম্বন করলে, তার পরিণাম বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

ইসলাম সংহতি, আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার উপর অত্যন্ত জোর দেয় এবং এ বিষয়ে অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের মন ও হৃদয়ে শান্তির জন্য এগুলো অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম সমাজের প্রয়োজনে এমন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয় যা সুখের আশাকে ভ্রষ্ট হতে দেয় না। কোন আচরণ শুরুতে যতই নির্দোষ মনে হোক না কেন, তা যদি সমাজের ক্ষতির দিকে অগ্রসরের আশংকা-যুক্ত হয়, তবে তাকে প্রতিহত করা উচিত। নচেৎ সেটা সমাজকে বহুমুখীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এক ঠিক উল্টো বিষয়ে জোর দেয় ইসলাম। সুখ ভোগ থাকবে বটে, তবে সেটা গোটা সমাজের মানসিক-শান্তি ও নিরাপত্তার বিনিময়ে নয়। সেইসব যাবতীয় প্রবণতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে। যেগুলো বাধাহীন থাকলে ক্রমাগতভাবে পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা, অশ্লীলতা, অপরাধ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ইসলামে পারিবারিক ইউনিট সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন পারিবারিক পদ্ধতি নিরাপদ রাখা সম্ভব।

সমাজে প্রকৃত শৃংখলা গড়ে তোলার জন্য ইসলাম কন্যা বা নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে সকল বিষয় তাগিদ দিয়ে অনুশীলনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে কুরআন মজিদ এবং হযরত (সঃ) এর পবিত্র হাদিস আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গগুলো হল;

- ❑ ইসলামপূর্ব আরবে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
- ❑ নারী অধিকারে নবযুগের সূচনা
- ❑ হযরত (সঃ) এর নারী বা কন্যার প্রতি মমতা প্রদর্শনে অনুপম শিক্ষা
- ❑ নারী-পুরুষের পৃথকীকরণ
- ❑ নারীর সম-অধিকার
- ❑ একাধিক বিবাহ
- ❑ বৃহত্তম পরিবারের ধারণা
- ❑ ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী-লোকের অধিকার

## ইসলামপূর্ব আরবে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদে আল্লাহতায়ালা বলেন, উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং যে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। উহাতে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে

পুঁতিয়া দিবে! সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিষ্ঠুর! (আল-কুরআন ১৬ ঃ ৫৮-৫৯)

এ আয়াতে আরবের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে কন্যা-সন্তান হলে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলা হতো, এই পৈশাচিক, বর্বর ও অমানবিক প্রথার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবরা তাদের নারী গোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করত এবং চরম নিম্নস্তরে নারীর স্থান দিত। কুরআন মজিদ নারীর সম্মানজনক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এবং তাদের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন-মজিদকে অদ্বিতীয় ও অনুপম বলা যায়।

**এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা**

**এক)** এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে হযরত (সঃ) এর নিকটে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমরা বর্বর ছিলাম, প্রতিমা পূজা করতাম, নিজে সন্তানদের হত্যা করে ফেলতাম। আমার এক কন্যা সন্তান যখন কিছুটা বড় হলো, আমি ডাকলে সে খুব খুশী হয়ে দৌড়ে কাছে আসত। একদিন আমি তাকে আমার সাথে আসতে বললাম। সে খুশি হয়ে আমার পিছনে হাঁটতে থাকলো। আমি বাইরের দিকে যেতে যেতে আমাদের জমিতে একটি কুয়ার কাছে আসলাম। আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে ছিল না। আমি আমার মেয়েকে তুলে কুয়ায় ফেলে দিলাম। আমি মেয়ের চিৎকার শুনলাম, ও আমার আব্বা! ও আম্মা!

সেই বর্বর জাহেল বর্ণনা শুনে হযরত (সঃ) কেঁদে ফেললেন। হযরত (সঃ) এর চোখের পানি ঝরতে দেখে সেই ব্যক্তিকে মজলিশের একজন বললেন, 'তুমি আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) কে দুঃখ দিলে! হযরত (সঃ) সেই ব্যক্তিকে বললেন, তুমি চুপ থাক। এ ব্যক্তি আমাকে এমন প্রশ্ন করে ফেলেছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর হযরত (সঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তোমার ঘটনা আবার বলল। সে ব্যক্তি পুনরায় ঘটনা বর্ণনা করল, হযরত (সঃ) এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে ঝরতে তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যাচ্ছিল। হযরত (সঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা জাহেলীগুলো (ইসলামপূর্ব) ক্ষমা করেছেন, এখন থেকে পুণ্যকর্ম করে যাও।' (হাদিস শরীফ দারমী আল্-মুকাদ্দামা)

**দুই)** এক ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য অন্য অঞ্চলে গিয়েছিল। ইত্যবসরে তার এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সে ফিরে আসলে তার স্ত্রী তাকে বলে যে, এ কন্যা সন্তান তার বোনের। মা ভয় পাচ্ছিলেন যে পিতাকে কন্যা সন্তানের কথা বললে হয়ত সে একে জীবিত কবর দিয়ে দিবে। কিছু দিন পর যখন মেয়ে কিছুটা বড় হয়ে গেলো তখন মা দেখলেন যে, মেয়ের বাবা মেয়েকে খুব আদর করে। তখন মা ভাবলেন এখন হয়ত মমতা জন্মে গেছে। এখন হয়ত সত্যকে জানলে, সে তার কন্যাকে মেরে ফেলবে না। তখন মেয়েটির মা তার স্বামীকে বলে দিলেন যে, "এ তো তোমারই মেয়ে" বাবা শুনে বললেন ঠিক আছে। এক ফাঁকে সে নিজ কন্যাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কবর খুঁড়ে তাকে কবর দিয়ে দিল। যখন বাবা মেয়ের শরীরের উপর দ্রুত মাটি ফেলে চাপ দিচ্ছিল মেয়েটার কান্নার শব্দ আসছিল, 'আব্বা তুমি কি করছো? আব্বা তুমি কি করছো?' আস্তে আস্তে মেয়েটার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। এ ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (সঃ) বললেন, 'মান লা ইয়ার হাম, লা ইউরহাম' অর্থাৎ যে নিজে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।

**হযরত (সঃ) এর নারী বা কন্যার প্রতি মমতা প্রদর্শনে অনুপম শিক্ষা (হাদিসসমূহ থেকে)**

**নারীর উচ্চতম সম্মান**

হাদিস-১ আবদুল্লাহ ইবন ওমর ইবনে আস বর্ণনা করেন মহানবী (সঃ) বলেন–বিশ্ব আল্লাহতালার এক নেয়ামত এবং এর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল উত্তম স্ত্রীলোক। (মুসলিম শরীফ)

❑ হযরত (সঃ) উত্তম স্ত্রীলোককে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তৎকালীন আরববাসীকে নারী জাতির প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

**নারী বা কন্যার প্রতি সহানুভূতির অনন্য দৃষ্টান্ত**

হাদিস-২ হযরত (সঃ) ওমরাহ পালন করে মক্কা থেকে মদীনা ফেরত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হামজা (রাঃ)'র এতিম কন্যা উমামা (মক্কায় ছিলেন) চাচা! চাচা! বলে চিৎকার করতে করতে হযরত (সঃ) এর কাছে দৌড়ে আসল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে দু'হাতে তুলে নিলেন এবং হযরত ফাতেমাকে দিলেন এবং বললেন, এই নাও তোমার চাচাত বোন। হযরত জাফর তাইয়াব (রাঃ) দাবী করলেন যে, এ কন্যা আমার পাওয়া উচিত কারণ, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার গৃহিণী। হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, এ কন্যা আমার পাওয়া উচিত, কারণ এর পিতা হামযা (রাঃ) আমার ধর্মের ভাই ছিলেন। হযরত আলীর (রাঃ) দাবী ছিল আমার কোলে সে দৌড়ে এসেছে, এ আমার বোন। হযরত (সঃ) পরস্পরের ভালবাসার দাবীগুলো অত্যন্ত আনন্দে অবলোকন করছিলেন এবং হাসছিলেন। তারপর হুজুর (সঃ) কন্যাকে তার খালার কাছে দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের সমান। (সহি বুখারী শরীফ, বাব ওমরাতুল কাযা)

হাদিস-৩ হযরত রসুল (সঃ) এর একটি চমৎকার রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, এক মহিলা মক্কার দিকে আসছিলেন, তখন তাকে অনেকেই ভয় দেখিয়ে ছিলেন যে, তুমি মক্কা যাচ্ছ তবে খুব সাবধান। মনে রেখ সেখানে মুহাম্মদ নামে এক যাদুকর আছে, তার থেকে সতর্ক থেকো। সে বড় শক্ত যাদুকর। যে রাস্তায় সে চলাফেরা করে, সে রাস্তা দিয়ে তুমি হাঁটবে না। মহিলা বললেন ঠিক আছে। মহিলা মক্কায় প্রবেশ করেই প্রথম যে ব্যক্তির দেখা হলো, তিনি হলেন মুহাম্মদ (সঃ), মহিলা হযরত (সঃ) কে বললেন, দেখ শুনেছি এখানে বড় যাদুকর একজন আছে যার নাম মুহাম্মদ! জান সে কে; কোন রাস্তা দিয়ে সে চলাফেরা করে? বৃদ্ধা মহিলার হাতে বড় একটা বোঝা (গাঠরি বা থলে) ছিল। মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, বোঝাটা নিয়ে হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, বেশ ভারী

বোঝা–আমি তুলে নিচ্ছি। তোমাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি। তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি। তারা উভয়ে একত্রে রওয়ানা হলেন অবশেষে সেই বৃদ্ধা নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন। হযরত (সঃ) তার বোঝা নামিয়ে রাখলেন এবং বললেন, সেই যাদুকর আমিই। বৃদ্ধা বললেন, আরে তবে তো তোমার যাদু লেগে গেছে! আমি তোমার ধর্ম অবলম্বন করলাম।

- ❑ হযরত (সঃ) এর উল্লিখিত হাদিস অনুসারে নারী বা কন্যার প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এমনি সহানুভূতির প্রভাবে তৎকালীন আরব সমাজ এক মহাপরিবর্তনের দ্বার উন্মোচন করেছিল এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর (সঃ) সাহাবীগণ আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

### কন্যা-সন্তানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক

**হাদিস-৪** হযরত (সঃ) বলেন, আমার মেয়ে আমারই রক্ত মাংশ। যা তার সন্দেহ, সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমারও সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। (বোখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব ও মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফাযায়েল)

- ❑ কন্যা সন্তানকে হযরত (সঃ) অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন, তাঁর সত্ত্বাকে কন্যা থেকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে পারেননি।

### কন্যা-সন্তান প্রতিপালনের কল্যাণ

**হাদিস-৫** হযরত (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তির কন্যা-সন্তান হয় এবং সে তাকে জীবিত রেখে লালন পালন করে এবং সে তার প্রতি অবহেলা করে না পুত্র-সন্তানের চেয়ে কম মর্যাদা দান করে না। তাকে জাহান্নামে থেকে রক্ষা করা হবে। সে কন্যা নিজ পিতা ও জাহান্নামের মাঝখানে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে। (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল আদব)

**হাদিস-৬** হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ যদি কাউকে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে কোন পরীক্ষায় ফেলেন। আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তাহলে ঐ সব কন্যা-সন্তান তাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব ও মুসলিম শরীফ, কিতাবুল বিররে)

**হাদিস-৭** হযরত (সঃ) বলেছেন, কোন পিতার কন্যা-সন্তান যদি সংকটে পড়ে এবং পিতা সে সন্তানের প্রতি মমতাপূর্ণ ও দয়ালু হয়, তবে সে (পিতাকে) জাহান্নামের হাত থেকে রক্ষা করবে। সে নিজ পিতা ও জাহান্নামের মাঝখানে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারি শরীফ, কিতাবুল আদব)

**হাদিস-৮** হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী বলেছেন, যে ব্যক্তি দুইজন মেয়েকে শৈশব থেকে লালন করবে, সে আমার সাথে পরকালে এক হাতের দুই আঙ্গুলের মতো যুক্ত থাকবে। (মুসলিম শরীফ)

**হাদিস-৯** হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন স্ত্রীলোক দুইজন কন্যাকে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা করতে এলেন। তাদেরকে দেওয়ার মতো একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না, সেটা আমি তাদেরকে দিলাম। স্ত্রীলোকটি নিজে না খেয়ে খেজুরটা দুইভাগ করে তার কন্যাদের দিয়ে দিলেন। তারপর তারা উঠে চলে গেলো। যখন মহানবী (সঃ) ঘরে ফিরলেন, আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, যে কন্যাদের সাহায্য করে এবং ভালো শিক্ষা দেয়, সে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

**হাদিস-১০** হযরত (সঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সদকার কথা বলবো না। তোমার যে কন্যা (বিধবা হওয়া কিংবা তালাক দেওয়ার কারণে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি ছাড়া তার দায়িত্ব নেয়ার বা উপার্জনকারী আর কেউ নেই। (ইবনে মাযা, আবওয়াবুল আদব)

❑ হযরত (সঃ) কন্যাকে উত্তমভাবে লালন-পালনের তাগিদ দিয়েছেন। কন্যা-সন্তান লালনে পুত্র-সন্তানের চেয়ে কম মর্যাদা দেয়া যাবে না, উল্লেখ করে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, উত্তম লালনকারীকে পুরস্কার হিসেবে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবার জোরালো প্রতিশ্রুতি মহানবী (সঃ) দিয়েছেন। বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা কন্যার প্রতি দায়িত্ব পালনকে মর্যাদাপূর্ণ নেক কাজ হিসেবে সমাজে অনুসরণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

**নারীর প্রতি সুমনোভাব পোষণ**

**হাদিস-১১** আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী বলেন, কোন মুসলিম পুরুষ মুসলিম নারীর সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণে সায় দিবে না। (মুসলিম শরীফ)

**হাদিস-১২** আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, স্ত্রী-লোকের সাথে সদয় ব্যবহার কর। স্ত্রী-লোককে পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে এবং পাঁজরের হাড় সবচেয়ে বাঁকানো। তুমি যদি এটাকে সোজা করতে চাও তবে এটা ভেঙ্গে যাবে। এবং যদি এটাকে রেখে দাও, তবে বাঁকা বাঁকাই থাকবে। তাই তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। (বুখারী শরীফ)

**হাদিস-১৩** মহানবী (সঃ) বলেন, স্ত্রী লোকদের পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে, তুমি তাকে সোজা করতে পারবে না। যদি তুমি তাদের থেকে কল্যাণ লাভ করতে চাও, তবে বক্রতাকে উপেক্ষা করো। (আবু দুউদ শরীফ)

❑ হযরত (সঃ) নারীর প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব পরিহারের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। স্ত্রীলোক থেকে কল্যাণ পেতে তার নারীসুলভ (বক্র) আচরণের সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষার পাশাপাশি স্ত্রীলোকদের বক্রতাকে তার সৌন্দর্য বা রহম হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

## নারীর মর্যাদাপূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি

**হাদিস-১৪** মোয়া-ই-ইবনে হায়দার বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সঃ) যে প্রশ্ন করলাম একজন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট কি অধিকার? তিনি বললেন, যখন তুমি খাও তখন তুমি তাকে খাওয়াও, যখন তুমি কাপড় পর তখন তুমি তাকেও পরাও। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে বাড়ির বাইরে আলাদা করো না। ঘর ছাড়া বাইরে তুমি তার থেকে নিজেকে আলাদা করো না। (আবু দাউদ শরীফ)

**হাদিস-১৫** আয়াস ইবন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, মহানবী (সঃ) বলেন যে, আল্লাহর দাসীকে আঘাত করো না। কিছুদিন পরে উমর (রাঃ) এসে তাঁকে বলেন, স্ত্রী-লোকরা তার স্বামীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছেন। তিনি (সঃ) তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অনুমতি দিলেন। তারপর বেশ কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক মহানবী (সঃ) এর স্ত্রীর কাছে এলেন এবং তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। মহানবী (সঃ) ঘোষণা করলেন, অনেক স্ত্রীলোক আমার স্ত্রীর কাছে এসে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এ লোকগুলোর আচরণ ভালো নয়। (আবু দাউদ শরীফ)

**হাদিস-১৬** মহানবী (সঃ) বলেন, নারী মুসলমানের কল্যাণের জন্য নিঃসন্দেহে শত্রুকে আশ্রয় দান করতে পারবেন। (তিরমিযী শরীফ, আবওয়াবুম সায়র)

**হাদিস-১৭** হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়াতে জানা যায় যে, হযরত (সঃ) বলেন, নারী যুদ্ধরত কোন ইমানদার লোককে আশ্রয় দিতে পারবে এবং তা কার্যকর হবে। (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ)

**হাদিস-১৮** এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, মক্কা বিজয়ের সময় উম্মে হানী নবী (সঃ) কে বলেন, হে আল্লাহর রসুল (সঃ) আমি ইবনে হুবায়রাকে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আলী (রাঃ) বলেছেন, তিনি তাকে হত্যা করবেন। তখন নবী (সঃ) বলেন, উম্মে হানী তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। (বোখারী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ)

❑ এই হাদিসগুলোয় হযরত (সঃ) নারীর প্রতি সদাচরণ কিভাবে করতে হবে তার পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। নারীর অধিকার পুরুষের সমান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে পুরুষকে উত্তম হিসেবে গণ্য হতে, তার স্ত্রীর নিকট উত্তম আচরণের অধিকারী (শর্ত হিসেবে) হতে হবে। অধিকন্তু, সমাজের প্রয়োজনে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা স্বীকৃতি দেয়ার অনুসরণীয় শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে।

## নারী পুরুষের পৃথকীকরণ

ইসলামের পর্দা প্রথাকে পাশ্চাত্যের লোকেরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝে থাকে। পর্দা (আক্ষরিক অর্থে আবরণ) কে তারা দেখছে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা শ্রেণীগত পৃথক করার ব্যবস্থা হিসেবে। এই ভুল বুঝাবুঝি মুসলিম জাহানের বহু এলাকায় সত্যিকার ইসলাম শিক্ষার অপপ্রয়োগের দরুন এবং বাকী অংশটা পাশ্চাত্য গণমাধ্যমগুলোর নেতিবাচক ভূমিকার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের কথা উঠলে

একটা কুৎসিৎ অভিব্যক্তি প্রকাশ করা। অথচ ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুদের ক্ষেত্রে বা তাদের নিজ ধর্মের ব্যাপারে তেমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে না।

নারী-পুরুষ পৃথকীকরণের যে নির্দেশ ইসলাম দেয়, তা কোনভাবেই প্রাচীন অন্ধকার যুগে সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত নয়। বস্তুত সমাজে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা প্রশ্নের সঙ্গে সময়ের অগ্রমুখিতা বা পশ্চাতমুখিতার সম্পর্ক নেই। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, সমাজের সামাজিক বা ধর্মীয় তরঙ্গমালা হয় তুঙ্গে অগ্রসর হয়েছে, নয় তো তলায় পড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

নারী মুক্তি আন্দোলন ধারণাটা কোন মতেই সমাজের প্রগতিশীল প্রবণতা নয়। এমন বহু জোরালো প্রমাণ রয়েছে যে, মানব ইতিহাসের নিকট অতীতে যেমন, তেমনি দূর অতীতেও নারী শ্রেণী হিসেবেই দুনিয়ায় বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।

নারী-পুরুষে মুক্ত ও অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটা সমাজে নতুন বা অভিনব কিছু নয়। সভ্যতা এসেছে এবং গেছে। আচরণের পদ্ধতি এক ধরন থেকে অন্য ধরনে পাল্টিয়েছে। অজস্র সামাজিক প্রথা ও প্রবণতা বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই দৃশ্যের প্রতিটি পট-পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আজ পর্যন্ত কোন একটা প্রথা বা প্রবণতা স্থিরতা পায়নি। এতে আমরা নিশ্চিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, সমাজ (সারাটা ইতিহাসে নারী-পুরুষের) পৃথকীকরণ পর্যায় থেকে মুক্ত ও অবাধ মেলামেশার পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কিংবা অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত ও স্বাধীনতা পেয়েছে।

## নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নবযুগের সূচনা

মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলাম ঐশী নির্দেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও অমুসলমানগণ মনে করে যে, ইসলাম মুহাম্মদ (সঃ) এর নিজের শিক্ষা। তাদের ধর্মবেত্তা অনেকের অভিমত যাই হোক না কেন, আসল সত্য এটাই যে, ইসলাম নারী-পুরুষ পৃথকীকরণের যে শিক্ষা দেয়, সেটা কোন ক্রমেই আরববাসিদের আচরণের প্রতিফলন নয়। সে সময়ে নারীর প্রতি আরব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চরমভাবে পরস্পর বিরোধী। একদিকে যৌনাচারের অনুমতি, নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশা, শুরা, নারী আর গানবাদ্যের উন্মত্ত উৎসবে মেতে থাকা। অপরদিকে কন্যা-সন্তান জন্মকে অমর্যাদাকর ও চরম লজ্জাকর মনে করা। এমন কি, কোন কোন গর্বিত আরব এই কলংক থেকে বাঁচার জন্য নিজ হাতে সদ্য প্রসূত কন্যাকে কবর দিত বলে কথিত আছে (ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে)। এটা ছিল তখনকার আরবী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি মনে করা হতো। তাদের স্বামী, পিতা, ভ্রাতা পরিবারের বা অন্য কোন পুরুষ সদস্যের বিরোধিতা করার অধিকার পেত না। তবু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। তখন এমন দেখা যেত যে, নেতৃত্বের অসাধারণ গুণসম্পন্ন কোন কোন মহিলা তার গোত্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পৃথকীকরণ শিক্ষার মাধ্যমে যৌন-অরাজকতা এক চোটেই বন্ধ করা গিয়েছিল। গভীর নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল। এই সঙ্গে নারীর

মর্যাদা এতো উঁচু স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, তাদের সাধারণ দ্রব্য সামগ্রীর মত অসহায় রূপে গণ্য করার অবকাশ ছিল না। তাদের কর্মক্ষেত্রগুলোয় সমান অংশীদারিত্ব দেয়া হতো। অথচ ইতোপূর্বে, তাদের ভাগ-বাটোয়ারা করা হতো অস্থাবর মালামালের মত। এখন তারা নিজেরাই সম্পত্তির ওয়ারিশ। ওয়ারিশ শুধু পিতার নয়, স্বামী, সন্তান, এমনকি আত্মীয়গণেরও। তারা এখন তাদের স্বামীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, কথার জবাব দিতে পারে। এখন তারা যুক্তি পেশ করে ভিন্নমত পোষণ করতে পারে। তারা যেমন তালাক পেতে পারে, তেমনি তালাক দিতেও পারে।

ইসলামে নারী 'মা' হিসেবে অত্যন্ত উঁচু সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন সমাজে কখনই ছিল না। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সঃ) নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐশী নির্দেশের আলোকে ঘোষণা দিয়ে গেছেন যে, 'মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশ্‌ত'।

মুহাম্মদ (সঃ) এর এ বাণী শুধু পরকালে পূর্ণ হবে না, এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এ কথা বলেননি। বরং তিনি এ বাণীতে এক সামাজিক জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ সমাজে লোকেরা জননীকে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করবে। তাদের সন্তুষ্ট রাখবে, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করবে।

এই নিরিখে ইসলামের পৃথকীকরণ শিক্ষাকে বুঝতে হবে। এটা কোন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য করা হয়নি, বরং তা করা হয়েছে ঘরে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর আস্থা গড়ে তোলার জন্যে মানবীয় মৌলিক কামনা-বাসনাকে মিতাচারী করার পাশাপাশি সেগুলোকে সংহত, নিয়মিত ও সুশৃংখল করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম বর্ণিত পৃথকীকরণকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হয়। মনে করা হয়, মুসলমান সমাজে নারী সম্প্রদায়ের উপরে এক প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে তারা মানবীয় কাজে ইচ্ছেমত অংশ নিতে পারে না, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। আসলে পৃথকীকরণের মাধ্যমে নারীর সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং সমাজে নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে অগ্রসর হওয়া।

ইসলাম নারীদের খেলার পুতুল হিসেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা অথবা পুরুষের ইচ্ছা ও অভিরুচির কৃপার উপর ছেড়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেয় না। এটা নারীর প্রতি একটা নিষ্ঠুরতা যে, সমাজের চাহিদা বেড়ে চলেছে বিধায় নারী তা পূরণ করার জন্য সর্বদা তাদের চাউনী, চেহারা, পোশাক-আশাক ও রূপ-চর্চার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। নারী-সৌন্দর্য তো যথেচ্ছা প্রদর্শিত হচ্ছেই। কোন খাদ্যদ্রব্য বা কোন দৈনন্দিন সামগ্রী যেমন সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বিক্রীর বিজ্ঞাপনে নারী মডেল না হলে যেন চলে না। এতে স্বপ্ন পূরণের জন্য কৃত্রিম স্টাইল করে ব্যয়বহুল জীবন পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে। এমন সমাজ ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে না এবং তা কখনও মিতাচারী ও সুস্থ থাকতে পারে না।

এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত সব (অশ্লীল) কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে অদম্য তাড়নার উদ্রেক হতে না পারে। নারীর কাছে এটাই প্রত্যাশিত যে, তারা শালীন ও সম্ভ্রমশীল পোশাক পরিধান করবে। তাদের এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা এমনভাবে চলাফেরা না করে, যার

দরুন রাস্তায় লোকেরা তাদের উপরে কুদৃষ্টি দিতে পারে। কস্‌মেটিক্‌স লাগাতে বা অলংকারাদি পরতে বারণ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, যেন এর মাধ্যমে অপর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা হয়।

বর্তমান সমাজগুলোর মন-মানসিকতায় এ শিক্ষাকে বেশ কঠোর, সীমাবদ্ধ এবং আকর্ষণহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গোটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে যে কেউ বলবেন যে, ঐ অভিমত হটকারী এবং ভাসা ভাসা। সুতরাং এ শিক্ষাকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বোঝার অবকাশ রয়েছে।

## নারীর সমঅধিকার

নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারী অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কথা শুনা যায়। এ ব্যাপারে ইসলাম একটা ব্যাপক মৌলিক নীতির কথা বলে, যার মধ্যে সব সমাধান রয়েছে। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (আল-কুরআন ২ ঃ ২২৮)

কুরআন মজিদে অন্য আয়াতের একাংশে বলা হয়েছে– 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হিফাজতে উহারা হিফাজত করে'। (আল-কুরআন ৪ ঃ ৩৪)

আরবী কাউয়ামুনা (অভিভাবকরা- যারা তাদের পোষ্যদেরকে সঠিক পথে চালাবার জন্য দায়ী) শব্দটি থেকে অনেক (মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন) আলেম নারীর উপরে পুরুষের নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চান। অথচ আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, পোষ্যদের উপরে উপার্জনকারীর একটা প্রধান্য রয়েছে। মৌলিক মানবাধিকার প্রশ্নে এখানে একথা বলা হয়নি যে, নারীর অধিকার সমান নয়, কিংবা নারীর উপর পুরুষের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত এখতিয়ারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষের এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, নারীর মৌলিক অধিকার ঠিক পুরুষের সমান। প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা সমান অধিকারের কথা বলেন, তারা ভুলে যান যে, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে নারী-পুরুষের কার্যাবলী ভিন্ন। সেজন্য তাদের দৈহিক গঠনও ভিন্ন। কাজেই এই ভিন্নতার কারণে সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রশ্নটা অবাস্তব।

শুধুই নারীই পারে সন্তান জন্ম দিতে। তারা কেবল ন'মাসের অধিক কাল ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের বীজ পরিচর্যা করতে পারে। নারীই তাদের বাচ্চাদেরকে, অন্তত বাচ্চাদের শৈশব কালে, লালন পালন করতে পারে যা কি না পুরুষেরা সেভাবে পারে না। সন্তানের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের রক্তসম্পর্কের কারণে সন্তানের উপর পুরুষের চাইতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন ও প্রভাব অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন সংক্রান্ত এই পার্থক্য যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপেক্ষা করা হয়, তাহলে সেই সমাজ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে। প্রধানত নারী ও পুরুষের গঠনগত পার্থক্যের কারণে ইসলাম উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা পালনের কথা বলে।

তাছাড়া নারীর গঠন তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও হাল্কা। তবু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ তাদের দেহে বরদাস্ত করার অধিক ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতার পিছনে কারণ হচ্ছে, তাদের জীবকোষে একটা অতিরিক্ত অর্ধ-ক্রোমোজম। যার দরুন নারী-পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ক্ষমতা তাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা বহনের জন্য যেমন, গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব এবং স্তন্যদান ইত্যাদির প্রয়োজনে। অবশ্য এ ক্ষমতা সত্ত্বেও নারীকে বাহ্যত অধিকতর মজবুত ও শক্তিশালী মনে হয় না। তাদের শুধু শুধু সমান অধিকারের নামে বা অন্য কোন নামে, উৎপাদনের জন্য কঠিন সব দৈহিক কাজে নিয়োজিত করা ঠিক হবে না। তাদের প্রতি অধিকতর নমনীয় হতে হবে। ঘরের দৈনন্দিন কাজে নারীর উপরে হাল্কা বোঝা চাপাতে হবে। তাদের উপরে জোর করে পুরুষের সমান বোঝা চাপানো হবে না। এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী ফরাসী লেখক এলড্র কেরল তার Man the Unknown গ্রন্থে বলেন, "নারী পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা মৌলিক। এসব পার্থক্য তাদের দেহের শিরা-উপশিরা গঠন পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়।" নারীর ডিম্বথলি থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়, তা তার দেহের সব অংশের ওপর প্রভাব ফেলে এবং নারী-পুরুষের স্বভাবগত ও মানসিক পার্থক্য প্রকাশ করে।

একই প্রসঙ্গে ডঃ ল্যামব্রেস গুনা তার নারীত্বের প্রাণসত্তা গ্রন্থে লিখেছেন, "নারী ও পুরুষ কেবল দৈহিক কাঠামো, দেহ-অস্থির গঠন এবং শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের দিক দিয়েই ভিন্ন নয়। বরং এ বিচারেও ভিন্ন যে, তারা একই পরিমাণ বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাদের রোগ-ব্যাধিও হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের চিন্তা ও নৈতিক পছন্দ-অপছন্দের মধ্যেও পার্থক্য আছে।" তিনি এই গ্রন্থে আরও লিখেন যে, পুরুষ ও নারীর সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো মনে রাখতে হবে। উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ এভাবেই সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটা গৃহের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম পরিচালনাকে যদি দায়িত্ব পালনের একটা বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সেটা যদি কোন নারী অথবা কোন পুরুষের উপরে বর্তানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, পুরুষের চাইতে নারী অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করছে। একই সঙ্গে ছেলে-মেয়ে লালনের যে দায়িত্ব নারীর উপর তা প্রকৃতিদত্ত। এই দায়িত্ব পালনে পুরুষ খুব সামান্যই অংশ নিতে পারে।

নারীকে অবশ্যই পরিবারের উপার্জনের মূল দায়িত্ব থেকে যতটুকু সম্ভব মুক্ত রাখতে হবে। উপার্জনের দায়িত্ব নীতিগতভাবে পুরুষের উপরেই বর্তায়। তবু নারীকে কেন সংসারের আর্থিক বোঝা টানার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে বাধা দেয়া হবে! চাইলে তারা উপার্জন করতে পারে। তবে সেজন্য তারা তাদের সন্তান জন্ম দেয়া, পরিবারের সেবা-যত্ন করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়িত্বাবলী পালনে অবহেলা করতে পারবে না। কেননা এগুলো হচ্ছে নারীর প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব। এগুলো আগে পালন করতে হবে, আর এটাই হচ্ছে ইসলামের কথা।

## একাধিক বিবাহ

পশ্চিমা দেশগুলোয় ইসলামে এই একাধিক বিবাহ বিষয় (পুরুষের একই সঙ্গে একাধিক বিবাহ) সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে গেলেই তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ইসলাম কি

পুরুষকে একইসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? আসলে এ প্রসঙ্গে ভাসা ভাসা ধারণা থাকার ফলে নেতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে একটি সত্য গল্প শুনুন, কয়েক যুগ আগের কথা, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সোস (School of Oriental and African Studies) এর একজন পাকিস্তানী ছাত্রকে তার এক ইংরেজ সহপাঠী ছাত্র (প্রায়শই প্রশ্ন তুলে) বেশ বিরক্ত করত এবং হাসি-ঠাট্টা করতো। সম্ভবত একদিন পাকিস্তানী ছাত্রটির উপর বেশি চাপ সৃষ্টির দরুন, সহসাই ইংরেজ ছাত্রটিকে সে প্রশ্ন করলো। আচ্ছা তোমরা তো আমাদের চারজন স্ত্রী রাখার ব্যাপারে আপত্তি তোল, কিন্তু তোমরা তো তোমাদের চারজন পিতা রাখার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোল না? 'চার' শব্দটির উপর সে এমন জোর দিয়ে কৌতুক সহকারে উচ্চারণ করেছিল যে, ইংরেজ ছাত্রটি থতমত খেয়ে গিয়েছিল। দৃশ্যত ব্যাপারটা ছিল একটা মস্করা মাত্র। কিন্তু আপনি এটাকে একটু গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে, এর মধ্যে মস্করার চাইতে অনেক বেশি কিছু ছিল। এতে পাশ্চাত্য সমাজে বিরাজমান দুর্দশার ইঙ্গিত করা হয়েছিল। ব্যাপারটা শুধু চিন্তা-ভাবনা মুক্ত ছাত্রদের খোশ-গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে ইসলাম এবং অধূনা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলনার সুযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে।

এক্ষেত্রে কুরআন মজিদে আল্লাহ বলেছেন যে- 'তোমরা যদি আশংকা কর যে, য়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা' (আল-কুরআন- ৪ ঃ ৩)।

ইসলামের বিধান (Provision) এ একাধিক বিবাহের কথা বলা হয়েছে, সেটা সর্বজনীন আদেশ নয়। প্রয়োজনের সময় সামাজিক সুস্থতা বজায় রাখার সাথে সাথে নারীর অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এমন অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন মজিদ একটি যৌক্তিক গ্রন্থ। সুতরাং তা মুসলমানদের অসম্ভব কিছু করার জন্য বলতে পারে না। আল্লাহ নারী-পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন প্রায় সমান-সমান সংখ্যায়। এই যুক্তিসম্মত বা র‍্যাশনাল ধর্মে বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কথা ও কাজের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কিভাবে এমন অস্বাভাবিক ও অবাস্তব একটা আদেশ দিতে পারে? আর সেটা কার্যকর করা হলে, সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে? ধরুন ছোট একটি দেশ, যার দশ লক্ষ বিবাহ-যোগ্য সমান সংখ্যক পুরুষ ও নারী আছে। সেই দেশে যদি বিবাহের এই আদেশটি এক আইন হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। তাহলে দেখা যাবে যে, আড়াই লক্ষ পুরুষ দশ লক্ষ নারীকে বিয়ে করে নিয়েছে এবং বাকী সাতে সাত লক্ষ পুরুষের ঘরে কোন বউ থাকছে না। কেমন অদ্ভুৎ এক সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হবে!

অথচ, দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম প্রত্যেক নর ও নারীকে বিয়ে করার কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছে। পবিত্র কুরআন মজিদে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ভালবাসার এবং একজনকে অপর জনের উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে-- 'এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের, সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইলো যদি তোমরা তাহাদের মাহ্‌র প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে। কেহ ঈমান প্রত্যাখান করিলে

তাহার কর্ম নিস্ফল হইবে এবং সে পবকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।' (আল-কুরআন ৫ ঃ ৫)।

একই সঙ্গে কোরআন মজিদ কৌমার্য আবলম্বনকে প্রত্যাখান করেছে এবং এটাকে একটা মানব-সৃষ্ট প্রথা বলে ঘোষণা দিয়েছে (আল্-কুরআন ৫৭ঃ২৭) কাউকে বাকী দুনিয়া থেকে আলাদা করে অথবা প্রাকৃতিক কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সত্বাকে শাস্তি দেয়ায় লাভ নেই। তাই ইসলামে বিবাহ-প্রথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

একাধিক বিবাহ কথায় ফিরে আসা যাক। কোরআন করীম পাঠে জানা যায় যে, বিশেষ পরিস্থিতির আলোক বহুবিবাহ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধের পরে দেখা যায় যে, সমাজে একটা বিরাট সংখ্যক ছেলে-মেয়ে এতীম হয়ে যায়। বহু যুবতি নারী বিধবা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর জার্মানীতে এধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম যেহেতু জার্মানির প্রধান ধর্ম নয়, সেহেতু জার্মানি এ সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি। সুতরাং জার্মানিকে সেদিন যুদ্ধের পরিণতিতে সামাজিক ভারসাম্যহীন দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন বিরাট সংখ্যক বয়স্ক অবিবাহিতা নারী, যুবতী বিধবা ছিল এবং তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বিশাল ইউরোপ মহাদেশে শুধু জার্মানি এই বিরাট ও চরম বিপজ্জনক সামাজিক সমস্যার শিকারে পরিণত হয়েছিল তা নয়। বরং গোটা পাশ্চাত্য সমাজে তখন এ সমস্যা বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছিল। এই প্রতিকূল অবস্থাকে তারা মোকাবেলা করতে পারেনি। ফলে সমাজে বিরাজমান ভারসাম্যহীনতা উত্তাল বেগে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি সহজেই বলতে পারেন, এই সমস্যার সমাধান করতে হলে পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া। এজন্য বলা হচ্ছে না যে, এতে করে তাদের জৈবিক তাড়না পূর্ণভাবে মিটবে। বরং এটা এজন্যই বলা হচ্ছে যে, এতে করে বিপুল সংখ্যক স্ত্রীলোকের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো সম্ভব। এটাই যৌক্তিক এবং এটাই বাস্তব সমাধান। এই সমাধানকে যদি প্রত্যাখান করা হয়, তাহলে সমাজের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসেবে থাকবে, অপরাধক্লিষ্ট ও বাঁধনহারা হয়ে অতল গহ্বরে দ্রুত তলিয়ে যাওয়া।

হায়! এটাই বুঝি বেছে নিয়েছিল পাশ্চাত্য জগৎ। যদি এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবতার নিরিখে এবং আবেগমুক্ত মন নিয়ে পরীক্ষা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, প্রশ্নটা আসলে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে দায়িত্বশীলতা এবং দায়িত্বহীনতার মধ্যে কোন একটা বেছে নেয়ার। ইসলাম পুরুষকে একই সঙ্গে একাধিক বিয়ে করবার অনুমতি দেয় শুধু এই শর্তে যে, পুরুষেরা যাবতীয় দায়িত্বাবলী পালনের মাধ্যমে সেই কঠিন ও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি সামলানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে। তাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমতা বজায় রেখে চলবে এবং তাদের প্রতি যথার্থ সুবিচার করবে।

এর বিকল্প যেটা, তার চেহারা কুৎসিৎ না হয়ে পারে না। একটা সমাজে যদি অধিক সংখ্যায় অবিবাহিতা নারী থাকে তাহলে তাদের পর-পুরুষ আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ হওয়ার জন্য দোষ দেয়া যায় না। বিশেষত সেই সমাজ যদি ধর্মকর্ম পালনে তেমন নিষ্ঠাবান না হয়। নারীও মানুষ এবং তাদের আবেগ-অনুভূতি ও অতৃপ্ত কামনা-বাসনা আছে। যুদ্ধজনিত মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের কারণে যখন একজন সঙ্গীর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, বিয়ে-শাদী বা ঘর বাঁধবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না, তখন সেই জীবন শূন্যতায় ভরে ওঠে। এ-অবস্থায় নারীকে

যদি বৈধ উপায়ে জায়গা করে দেয়া না হয়; তাকে আপসে আদান-প্রদান নীতির ভিত্তিতে খাপ-খাইয়ে নেওয়া না হয়; তাহলে সে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বাধ্য। নারী তখন যে করেই হোক, অবৈধ উপায়ে অন্যের স্বামীর উপর ভাগ বসাবে এবং তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। আনুগত্য বিভক্ত হয়ে পড়বে। সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রী সমঝোতায় জটিলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা আরও বেশি করে অপরাধ করার প্রতি ধাবিত হবে। রোমান্স তার বিমল আনন্দ হারাবে এবং সেটা ইতরামির স্তরে নেমে ক্ষণিকের মোহে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এই অবস্থায় প্রধান শিকারে পরিণত হবে আনুগত্যের মহৎ আদর্শ।

## বৃহত্তম পরিবারের ধারণায় নারীর অবস্থান

নারীকে পুরুষের চাইতে ঘরে থাকার অধিক আমল দেয়া উচিৎ। যদি একই সময়ে তাদের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব পালনে ব্যপৃত থাকতে হয়। তাহলে তাদের যে সময় হাতে থাকবে, তা তাদের নিজেদের বা গোটা সমাজের জন্য কাজে লাগবে। এ থেকেই 'নারীর স্থান ঘরে' এই কনসেপ্ট বা ধারণা এসেছে। অবশ্য এমন কোন কথা নেই যে, তারা তাদের বোরকা বা এপ্রোনের ভেতরে আটকে থাকবে। কিংবা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকবে। ইসলাম কোন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার খর্ব করে না। তারা তাদের অবসর মুহূর্ত অবশ্যই তাদের কোন প্রয়োজনীয় বা পছন্দমত কোন সুস্থ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য বাইরে যেতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তারা যেন এমন কিছু না করে যাতে ভবিষ্যৎ মানব-প্রজন্মের স্বার্থ ও অধিকার বিপদের সম্মুখীন হয়। অন্যসব কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ– ইসলাম অতি-সামাজিকীকরণ বা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোর ভাবে নিরুৎসাহিত করে। কেননা ইসলামের কথা হল 'গৃহই নারীর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল' যা বর্তমান যামানায় অধিকাংশ সমস্যার জন্য বিজ্ঞ ও বাস্তব সমাধান। নারী যখন তার কাজকর্ম ঘরের বাইরে দূরে কোথাও সরিয়ে নেয় তখন তা করতে হয় তাদের পারিবারিক জীবনে শান্তির ও সন্তান পালনের দায়িত্বের বিনিময়ে। 'মা' কে কেন্দ্র করে তাঁর চার ধারে যে পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠে তার জন্য প্রয়োজন রক্ত-সম্পর্ককে জোরদার করা এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরিবারের ইউনিটগুলো আলাদাভাবে বাস করলেও, একটা বৃহত্তম পরিবারের ধারণাকে ইসলাম যে সমস্ত কারণে সমর্থন এবং উদ্বুদ্ধ করে, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :

- ❑ বৃহত্তম পরিবার সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করে;
- ❑ যদি একটা পরিবারের মধ্যেকার ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে অটুট ভালবাসা ও মমতার বন্ধন সৃষ্টি করা যায়। তাহলে এর মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবে একটা পরিবারের সামগ্রিক বন্ধন দৃঢ় হবে। এই বন্ধন সত্যিকার সমন্বয় ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে, যেমন চাচা-চাচী, ফুপু-ফুপা, মামা-মামী, খালা-খালু, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নি, চাচাতো-মামাতো, খালাতো-ফুপাতো, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতি-পুতি ইত্যাদি সম্পর্কের মাধ্যমে।
- ❑ এই অবস্থায় পরিবারের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা কমে যাবে। এক পরিবার নামে একই ছাদের নিচে বসবাস করাটা আজকাল (যেমন দেখা যায়) অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তেমনটা আর থাকবে না। পরিবারের সদস্যগণ পরিবারে কেন্দ্রীয় আলোকবর্তিকারূপ মুরব্বীদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। প্রায় সব

পরিবারের কর্মকাণ্ড এই অক্ষের চারিধারে আবর্তিত হতে থাকবে। কোন নিঃসঙ্গ, ভুলে যাওয়া, কোন প্রত্যাখ্যাত বা অবহেলিত ব্যক্তি পরিবার থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে না।

## ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী-লোকের অধিকার

সম্পদের বিতরণের ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র ইসলামই শুধু কন্যা বা স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে (আল-কুরআন ৪ ঃ ১১-১২)। মৃত ব্যক্তির সম্পদের নির্ধারিত অংশে তার ওয়ারিশ হিসেবে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সবার মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত কাউকে এ হক (ন্যায্য হিস্যা) থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং এ বিষয়টির বৈধতা নির্ধারণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত, কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়।

এ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর হলে স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে না। স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকারের সম্পত্তি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভাগ হতে থাকে, ফলে দেখা যায় যে, তিন চার প্রজন্ম পরেই বড় বড় জমিদারী ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে জমির উপরে একচেটিয়া মালিকানা টিকতে পারছে না এবং কোন কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটার সুযোগ থাকছে না।

## উপসংহার

ইসলামী সমাজ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এখানে নারীকে পুরুষের বা পুরুষকে নারীর পরিপূরক হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। এ দুটি সত্তা যেমন দুনিয়াতে স্বাধীন-স্বতন্ত্র, তেমনি আখেরাতেও স্বাধীন-স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী যে ভূমিকা পালন করে, তা হেরেমের উপপত্নীদের মত নয়। তেমনি কোন গৃহে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দীত্বও নয়। বরং যে গৃহে তারা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত সেখানেই তাদের প্রগতি বাধাগ্রস্ত। তবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যে কুৎসিৎ চিত্রখানি অংকন করা হয়, তার জন্য ইসলামের ভেতর এবং বাইরের উভয় মহাপণ্ডিতেরাই মূলত দায়ী। এই সব পণ্ডিতেরা ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে বুঝতে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন। নারীকে অবশ্যই যথেচ্ছ ব্যবহার করা এবং ভোগের সামগ্রীরূপ ভূমিকা পালন করা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তাদের হাতে অবশ্যই এমন যথেষ্ট সময় থাকতে হবে, যাতে তারা গৃহের দায়িত্ব এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব সযত্নে পালনের সুযোগ পায়।

ইসলামী ধারণা বা কনসেপ্টে গৃহ ও পরিবার হল সমাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ইউনিট। ইসলাম পরিবারের প্রতিটি ইউনিটের পরিসরকে নামেমাত্র না রেখে সেগুলোর প্রসার ঘটাতে চায়। এমন পরিবার হবে যার অভ্যন্তরের পারস্পরিক ভালবাসা দেয়া এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য পৃথিবীর আধুনিক সমাজগুলোতে পরিত্যক্ত, বৃদ্ধ অথবা পিতামাতাকে পরিবারের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এমন কষ্টকর অবস্থার শিকার অন্তত ইসলামী সমাজ হবে না।

সমাজে নারীর অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে সুসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তার 'নারীর মূল্য' পুস্তকে হিন্দু ধর্মের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মে নারী জাতির দুরবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর বহু সভ্য ও অসভ্য সমাজে নারীর দুর্দশার কথা বর্ণনা করে, শেষে তিনি লিখেছেন-- "ইহার পর ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইসলাম ধর্মে-- মুহাম্মদ নারী জাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, পুত্র-কন্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিধবা যাহার অবস্থা আরব ও ইহুদীদে মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরূপায় ছিল তাকে দয়া ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে হুকুম করিয়া গিয়াছেন। এ সব কথা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত তদানীন্তন আরব রমণীর ভয়ঙ্কর অবস্থার তুলনায় আরবের নব ধর্ম যে, নারীকে সহস্রগুনে উন্নত করিয়াছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।" ইসলামের এমন অনুপম সৌন্দর্যের উপলব্ধি শুধু মুসলমান সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভিন্ন ধর্ম বা মতাবলম্বিগণকে আকৃষ্ট করার অবকাশ পেয়েছে।

ইসলাম মানব সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী-পুরুষ পরস্পরের কর্তব্য ও অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মহানবী (সঃ) সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তিনি (সঃ) নিজের জীবন থেকে উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অন্যদের অনুপ্রাণীত করেন। ফলশ্রুতিতে একটি দৃঢ়, সুশৃঙ্খল ও সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা, এই শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণে মানব জগতকে কল্যাণ লাভে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন।

## তথ্য নির্দেশিকা

আল কুরআন ও হাদিস শরীফ এর উদ্ধৃতি (ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজিদের বঙ্গানুবাদও হাদিসসমূহ রেঃ ৩, ৪, ৫, ৭, থেকে) সংযোজিত।

তৌফিক চৌধুরী আহমেদ, যুগে যুগে নারী, কাছরে ছবীল পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮ (২য় সংস্করণ)

শামসুর রহমান গাজী, ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ, ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৯৮১ (১ম সংস্করণ)

হালিম আবু শুককাহ আবদুল, রসুল যুগে নারী স্বাধীনতা, আই আই এস এফ, ১৯৯৫ (১ম সংস্করণ)

জালালদ্দিন আনসার উমরী যাইয়াদ, ইসলাম সমাজে নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ (২য় সংস্করণ)

তাহের আহমদ মীর্যা, ইসলাম রেসপন্স টু কনটেমপরারী ইসুজ, ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাইলকেসন, ১৯৯২ (১ম সংস্করণ)

Khan M. Jafrullah, Garden of Rightious, Carjan press ltd. London, 1980 (2nd Edition)